[redacted]

[redacted]

ট্রাকভর্তি হয়ে বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা। কিন্তু এবছর গুণগত মান খারাপ ও উৎপাদন কম হওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী শসা পাওয়া যাচ্ছে না। কৃষকদের অভিযোগ, এমন পরিস্থিতিতে কৃষি বিভাগ পাশে নেই।

কালিগঞ্জ গ্রামের কৃষক আব্দুর রহিম বলেন, “দুই বিঘা জমিতে শসা লাগিয়েছিলাম। জমি প্রস্তুত, মাচা তৈরি, সার, কীটনাশক মিলে খরচ হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার টাকা। এখন বিক্রির উপযুক্ত সময়, অথচ গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে, শসার জালি শুকিয়ে বেঁকে লালচে হয়ে যাচ্ছে। নানা ওষুধ ব্যবহার করেও ফল পাচ্ছি না।

ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান জানান, প্রতিবছর এ সময় কয়েকশ টন শসা ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেটসহ বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হতো। কিন্তু এবছর তার অর্ধেকও পাঠাতে পারছি না।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ ইমরান হোসেন বলেন, অতিরিক্ত রোদ, জমিতে বোরনের ঘাটতি ও একই জমিতে বারবার একই ফসল আবাদ করার কারণে এমনটা হয়েছে। মাটি পরীক্ষা করে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে জমিতেই নষ্ট হচ্ছে ফুলকপি, লোকসানে কৃষক

মেহেরপুরে উৎপাদিত সবজির দাম ও ক্রেতা না থাকায় জমিতেই নষ্ট হচ্ছ ফুলকপি। জমি পরিষ্কার করতে ফুলকপি এখন গো খাদ্য হিসেবে নিচ্ছেন স্থানীয়রা ।

কৃষকরা জমি পরিষ্কার করে অন্য আবাদ করতে প্রস্তুতিও নিচ্ছেন। অনেক স্বপ্ন নিয়ে শীতকালীন ফুলকপি চাষ করেছিলেন চাষিরা। কিন্ত এখন উৎপাদন খরচ মিটছে না। এতে লোকসানে ঋনের বোঝা নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন যাচ্ছে মেহেরপুরের ফুলকপির চাষিদের।

জানা গেছে, স্বল্প খরচে বেশি মুনাফা পাওয়ার আশা নিয়ে রোপন করা

ফুলকপির এখন লোকসানে ফেলেছে চাষিদের।
কৃষকরা বলছেন, প্রতি বছর শীতকালীন সবজি হিসেবে ফুলকপির চাহিদা থাকে। চাহিদা থাকায় দামও ভালো পান তারা। লাভের আশায় চলতি মৌসুমেও অনেকেই ফুলকপির চাষাবাদ করেছেন। কিন্তু এ বছর নানান জাতের সবজিতে বাজার ভরে যাওয়ায় উৎপাদন ভালো হলেও মুনাফার অংক শূন্যের ঘরে।

প্রতিটি কপির উৎপাদন খরচ পড়ে ৭/৮ টাকা। সেখানে বর্তমান বাজারে চাষিদের ক্ষেতে প্রতি পিস ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ৩/৫ টাকায়। ফলে উৎপাদন খরচের অর্ধেকও উঠছে না। এছাড়া চাষিদের পারিশ্রমিকও প্রায় শূন্য। যারা ঋণ নিয়ে চাষাবাদ করেছেন তারা তা কীভাবে শোধ করবেন তা নিয়ে পড়েছেন দুর্ভাবনায়।

মেহেরপুরের সাহারবাটি সবজি গ্রাম নামে খ্যাত। সেখানেও কপির চাষ করেছেন চাষিরা। এছাড়া সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়ও প্রচুর চাষাবাদ হয় ফুলকপি ও বাঁধাকপির। এ জেলার চাহিদা মিটিয়ে মেহেরপুরের চাষিদের উৎপাদিত ফুলকপি রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের পাইকারি বাজারে বিক্রি হয়। জেলার চাষিরা ক্ষেতেই এসব ফসল বিক্রি করেন পাইকারদের কাছে। তারা ট্রাক বোঝাই করে ঢাকায় নিয়ে বিক্রি করেন। মেহেরপুর থেকে প্রতিদিন প্রায় শতাধিক ট্রাক ভর্তি হয়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। অথচ এবছর ট্রাক ভাড়া না উঠায় দুএকটা করে ট্রাক যাচ্ছে ঢাকা,চট্রোগ্রাম, বরিশাল, ফেনি ও সিলেট জেলায়।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে জেলায় এবছর ফুলকপির আবাদ হয়েছে ১ হাজার ১২০ হেক্টর, বাঁধাকপির আবাদ হয়েছে ১ হাজার ৬০ হেক্টর এর মধ্যে গাংনী উপজেলায় বিভিন্ন মাঠে ১৬০ হেক্টর ফুলকপি এবং ১৫৫ হেক্টর বাঁধাকপির আবাদ হয়েছে।

গাংনীর বাঁশবাড়িয়া গ্রামের চাষি শরিফুল ইসলাম বলেন, আমরা গত বছর ৬ বিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করে বিঘাপ্রতি লাভ পেয়েছিলাম সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লাভ হয়েছিল। সে আশায় এবার ১১ বিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করেছিলাম। সময়মত বিক্র করতে না পারায় জমিতেই সব কপি নস্ট হয়ে গেছে।

ভাটপাড়া গ্রামের কৃষক রেজাউল হক, নওপাড়া গ্রামের কৃষক লাভলু বলেন, দুই বিঘা জমিতে শীতকালীন ফুলকপির আবাদ করেছিলাম। একেকটি কপির ওজন হয়েছিল দেড় থেকে দুই কেজি ওজন। ক্রেতা নেই তাই জমি ছেড়ে

চলে এসেছি। অনেকেই গরু ছাগলের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। সার ও কীটনাশকের দোকানর বকেয়া, জমির লিজ খরচের টাকা নিয়ে খুব বিপদে আছি।

সাহারবাটি গ্রামের কৃষক শিরাজুল ইসলাম জানান, দুই বিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করেছিলাম।৫ হাজার টাকায় বিক্রি করেছি। দুই বিঘা জমিতে ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সব টাকায় লোকসান। পরে জমি পরিষ্কার করতে শ্রমিক খরচ হয়েছে। কলোনিপাড়ার কৃষক আলমগীর হোসেন বলেন, দেড়বিঘা জমির ফুলকপি বিক্রি করতে না পেরে জমিতে নস্ট হচ্ছে। নেয়ার লোক নাই,খাওয়ারও মানুষ নাই।

সাহারবাটির আজিজুল বলেন, ৩০ শতাংশ জমিতে ফুলকপির চাষ করেছি। এ জমিতে রোপণ করা ৫ হাজার চারায় উৎপাদন খরচ পড়েছে প্রতি পিস ৭/৮ টাকা। এখন ফুলকপির দাম প্রতি পিস ক্ষেতে বিক্রি করতে হচ্ছে ৩/৪ টাকা দামে। এটা এমন ফসল, পরিপক্ক হলে আর ক্ষেতে রাখা যায় না। রাখলে ক্ষেতেই নষ্ট হয়। উৎপাদন খরচই পাচ্ছি না। এর ওপর ঋণের বোঝা রয়েছে। ঋণ পরিশোধ করব কী দিয়ে, আবার পরিবারের খরচসহ আগামীতে ফসল উৎপাদনের টাকাও রইল না। বেশি দামে বীজ-সার কিনে কম দামে ফসল বিক্রি করলে তো মূলধন হারিয়ে যাচ্ছে।

ব্যবসায়ী ইদ্রিস আলী বলেন, আমরা যে দামে কফি কিনে ঢাকা ও চট্রোগ্রামে নিয়ে যাচ্ছি তাতে ভাড়ার টাকা হচ্ছেনা। দুবার লোকসান দিতে হয়েছে। শ্রমিক সর্দার মোশাররফ হোসেন বলেন, প্রতিবছর এসময় ট্রাক লোড করে ৫০/৬০ হাজার টাকা আয় করতাম।এবছর কাজ করছি কিন্ত কফি চাষিরা শ্রমিক খরচ দিতে পারছেনা। দুএকটা ট্রাক লোড করছি অনেক গৃহস্থ ঘরে থেকে টাকা পরিশোধ করছেন। এদিকে মেহেরপুরের কৃষকদের হতাশা দেখে “স্বপ্ন’ নামের একটি সংগঠন ইতোমধ্যে কৃষকদের সাথে সরাসরি ১০ হাজার পিচ ফুলকপি কিনেছেন ৫ টাকা পিচ দরে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা হরিরামপুরের ফুলকপি চাষি রাকিব হোসেন জানান, এ বছর আমি চার বিঘা জমিতে ফুলকপি চাষ করেছি। একবিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করতে খরচ হয়েতে ২৫ হাজার টাকা। সাথে রয়েছে শ্রমিক ও পরিবহন খরচ। লাভের মুখ দেখছি না উল্টো জমিতে ফুলকপি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল । সেখানে আশার মুখ দেখালো সুপারশপ স্বপ্ন । আমাদের থেকে ১০ হাজার পিস ফুলকপি কিনেছেন তারা। তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

স্বপ্ন’র মেহেরপুর আউটলেট অপারেশন ম্যানেজার মাজেদুল হক বলেন, আমরা ফুলকপি চাষিদের দুর্ভোগের কথা জানতে পেরেছি বিভিন্ন

মিডিয়ার মাধ্যমে। আমরা মেহেরপুরে বেশকিছু এলাকার কৃষকের দুর্ভোগের কথা জেনে ফুলকপি কিনেছি ন্যায্যমূল্যে। অন্যান্য ব্যবসায়ীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান থাকবে। মধ্যস্বত্বভোগীদের লাভবান না করে কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি সেতুবন্ধনের চেষ্টা করে আসছে স্বপ্ন। এই চেষ্টা সবসময় অব্যাহত থাকবে।

জেলা কৃষি বিপনন অনুসন্ধান কর্মকর্তা জিব্রাইল হোসেন জানান, বর্তমানে বাজারে ফুলকপির সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় এই সবজির চাহিদা কমে গেছে। যার কারণে কৃষকরা লোকসানে পড়েছে। লোকসান থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে বিভিন্ন ব্যাবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করে কৃষকদের সাথে সংযোগ করে দিচ্ছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

‘স্বপ্ন’-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাব্বির হাসান নাসির এ প্রসঙ্গে জানান, কৃষকের পাশে শুরু থেকেই আছি। তাঁদের মুখে হাসি সবসময়ই দেখতে চাই। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ‘স্বপ্ন’।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃঞ্চ হালদার বলেন, প্রতিবছর এ মৌসুমে মেহেরপুরে ব্যাপক ভাবে বাঁধাকপি ও ফুলকপির আবাদ হয়। হঠাৎ দরপতন হয়েছে। স্বপ্নকে এমন উদ্যোগ নেবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি । সেই সাথে বাইরের বাজারে পাঠানোর চেস্টা করছি।

ঝিনাইদহ জেলায় মানহীন বীজে লোকসানে কৃষক

ঝিনাইদহে মানহীন বীজ বিক্রি করে কৃষকদের সঙ্গে প্রতারণা করে যাচ্ছে বীজ বিক্রেতারা। তাদের নেই আমদানিকৃত বীজের সঙ্গনিরোধ সনদ ও কোম্পানী কর্তৃক বিক্রয় অনুমোদনপত্র। জেলাব্যাপী সিন্ডিকেট তৈরী করে কৃষকদের মাঝে চক্রটি মানহীন বীজ ছড়িয়ে দিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। আর এই বীজ কিনে শত শত কৃষক পথে বসেছেন। ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, জেলার বিএডিসি অনুমোদিত বীজ বিক্রয় প্রতিনিধি (ডিলার) রয়েছে ১৪২

কোয়ারেন্টাইন সনদ ও সঙ্গনিরোধ সনদ না থাকা সত্বেও মহেশপুরের পোষ্ট অফিস মোড়ের আমান বীজ ভান্ডার, বিসমিল্লাহ বীজ ভান্ডার, দুলারী হল পট্টির ভাই ভাই বীজ ভান্ডার ও উপজেলা চত্বর সংলগ্ন রহমান বীজ ভান্ডারের বিরুদ্ধে দেদারছে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অসাধু এসব বীজ ব্যবসায়ীরা প্রভাব খাটিয়ে লাগামহীন ব্যবসা চালিয়ে গেলেও জেলা ও উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মকর্তারা নগদ নারয়নে তুষ্ট হয়ে নীরব ভুমিকা পালন করছেন।

কৃষকরা জানান, কৃষি কর্মকর্তাদের কাছে দোকানের বীজের মান ও অনিয়মের অভিযোগ দিলেই কৃষি কর্মকর্তাদের ঘুষের রেট রেড়ে যায়। বীজ বিক্রেতাদের নানা অনৈতিক সুবিধা নিয়ে ঝিনাইদহের কৃষি বিভাগ তুষ্ট থাকেন বলে কথিত আছে।

হরিণাকুন্ডুর উপজেলার পায়রাডাঙ্গা গ্রামের কৃষক মিজানুর রহমান ও হাফিজুর রহমান অভিযোগ করেন, গত মৌসুমে তারা সরকারি পেয়াঁজের বীজ নিয়ে প্রতারিত হয়েছেন। সরকারি পাওয়া বীজে চারা গজায়নি। মহেশপুর উপজেলার পাঁচলিয়া ইউনিয়নের ভুট্টাচাষী শ্যামল বিশ্বাস জানান, শহরের বড় বড় দোকান থেকে বীজ কিনে রোপন করেছি। কিন্তু বীজের কাক্সিক্ষত অঙ্গুরোদগম হয়নি।

অভিযোগের বিষয়ে ঝিনাইদহ শহরের শহিদ বীজ ভান্ডারের মালিক শহিদুল ইসলাম শহিদ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমি ব্যবসা করে আসছি। যেসব অভিযোগ উঠেছে, তার কোনো ভিত্তি নেই।

অন্যদিকে কপির মানহীন চারা সরবরাহের অভিযোগ থাকা সত্বেও হাসান বীজ ভান্ডারের মালিক হাসান আলী জানান, যারা অভিযোগ করেছেন তাদের ২ জনকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। তাছাড়া আমার সকল কাগজপত্র ঠিক আছে।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায় জানান, বীজ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের নিদ্দিষ্ট বিভাগ রয়েছে। যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা ব্যবস্থা নেবো।

ঝিনাইদহ জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন পলাশ মানহীন বীজে বাজার সয়লাব প্রসঙ্গে জানান, বীজ প্রতয়ন অফিস ধান, গম ও আলুর বীজের প্রত্যয়ন দিয়ে থাকে। এখানে আইনের কিছু ঘাটতি আছে। সবজি বীজের মান ঘোষণা করতে হলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ল্যাব থাকতে হবে। এবং সেখানেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বীজ বাজারজাত করতে হবে। কিন্তু বেশির ভাগ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ল্যাব নেই। তবে কোন বীজের দোকানের বিরুদ্ধে যদি নিদর্◌িৃষ্ট অভিযোগ থাকে,

তাহলে আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

পানের বাজারে ধ্বস, লোকসানে পড়েছে হরিণাকুণ্ডুর পান চাষীরা

বিয়ে কিম্বা কোন অনুষ্ঠানাদিতে পান না দিলে যেন তা পূর্ণতা পায়না। বাঙ্গালী জাতির পান দিয়ে আপ্যায়ন একটি পুরাতন অভ্যাস। প্রচলন আছে ধান, কলা, আর পান হরিণাকুণ্ডুর প্রাণ, কিন্তু এবছর পানের দামে ধ্বস নামায়, বিপাকে পড়েছে উপজেলার পান চাষীরা।

চাষীরাদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে উৎপাদন করতে হয় পান। আর সেই পান বিক্রয় করতে হচ্ছে পানির দরে, হারিয়ে যাচ্ছে প্রাণের ফসল পান। ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে না পারায় পান চাষে আগ্রহ হারাচ্ছে চাষীরা।

জানা যায় এক সময়ে এই পান উপজেলার চাহিদা মিটিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে প্রচুর আয় করতো ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চাষীরা। বড় সাইজের যে পান বিক্রি হতো প্রতি বিরা বা পোন ১০০ থেকে ১১০ টাকা, সেই পান এখন বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৪০ টাকা দরে। এছাড়াও ছোট সাইজের পান বিক্রি হচ্ছে আট-দশ টাকা থেকে পনের-ষোল টাকা দরে, পানের বাজারের এই বিপর্যায়ের সাথে রয়েছে বিভিন্ন কিটনাশক, বাঁশ, বিছালি ও শ্রমিকের বাড়তি মুজুরী। ব্যাপক লোকসান গুনে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন কৃষকেরা।

উপজেলার বড় পানবাজার ভবানীপুর, জোড়াদাহ, শাখারিদাহ, হরিণাকুণ্ডু আমের চারা, এসব বাজারে সরজমিনে গিয়ে চাষীদের সাথে কথা বললে দেখা গেছে একরাশ হতাশা। স্থানীয় বাজারগুলোতে এক সময়কার চাষীদের চোখে ছিলো রঙ্গিন স্বপ্ন। বেচা কেনা হতো পঁচিশ ত্রিশ লাখ টাকার পান। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে হই হুল্লোড় করে ছূটে আসতো পাইকারি ক্রেতা বিক্রেতারা। কিন্তু এখন পানের নায্য মুল্য না পাওয়াই বহন করে আনার ভাড়াও জুটছে না চাষীদের। উপজেলার তৈলটুপী, জোড়াদাহ, ভেড়াখালী, হরিণাকুণ্ডু, পার্বতীপুর, দখলপুর, দৌলৎপুর,

কেষ্টপুরের পান বরজের মালিকেরা জানালেন চরম লোকসানের কথা।

আড়ৎদার ভবানীপুর পান বাজারের সভাপতি কাসেম মিয়া জানান, আমি দীর্ঘদিন ধরে পান ব্যবসার সাথে জড়িত, বর্তমানে পানের দাম খুবই কম। অর্ধেক দামে বিক্রয় করতে হচ্ছে পান, চার শত টাকা জনের দাম, এক আটি মুটির দাম পাঁচ শত টাকা, ওয়াসীর দাম সাত শত, বিছালির দাম সাত শত টাকায় কিনতে হয়। বাজার মন্দা থাকায় পান চাষী এবং ব্যবসায়ীরা ব্যাপক লোকসানের মধ্যে রয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু কৃষি কর্মকর্তা শহীদ মোহাম্মদ তিতুমীর জানান, উপজেলার প্রায় ১হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে পান চাষ হয়। পান চাষীরা কোন ধরণের কারিগরি পরামর্শ চাইলে তা কৃষি অফিস কি ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পান চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী সকল ধরনের পরামর্শ প্রদান, মাঠ পরিদর্শন পূর্বক সঠিক পরামর্শ দেওয়া হয়। নিরাপদ বাজারজাত করণযোগ্য পান উৎপাদনে সকল পরামর্শ প্রদান করে নতুন চাষিদের আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পান চাষে সকল পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। পানের প্রধান সমস্যা পঁচা রোগ নিয়ন্ত্রণে বোর্দো মিশ্রণ তৈরি করা এবং তা সঠিক মাত্রায় ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করে থাকি। তবে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ও পানের আধুনিক জাতের অভাবের কথা জানান তিনি।

পাটকাঠি বিক্রি করে লোকসান তুলতে হচ্ছে মেহেরপুরের পাট চাষিদের

মেহেরপুরে কয়েক বছর যাবৎ বৈরী আবহাওয়ার কারনে সেচের পানি ব্যবস্থা করে পাট আবাদ করেছিলেন চাষিরা। ভাল লাভের আশায় পাট চাষ করলেও কাংখিত ফলন বিপর্যয় ও ন্যায্য দাম না পাওয়ায় হতাশ চাষিরা। চাষিরা বলছেন এবছর পাটের আঁশ কম এবং দামও কম। খরচের টাকায় উঠছেনা। পাটের মূল্যবৃদ্ধি না হলে আগামীতে পাট চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন বলে জানিয়েছেন তারা।

পাটের আবাদ করবোনা। অন্য আবাদে ফিরে যাব।

ভাটপাড়া গ্রামের পাটচাষি আব্দুল আলিম বলেন, ভারতের মহারাষ্ট্র জাতের পাট লম্বা হয় ৭ থেকে ৮ ফুট। কিন্তু এবছর অনাবৃষ্টির কারনে পাট বাড়তে পারেনি। ৪থেকে৫ ফুট লম্বা হয়েই পাট জমিতে শুকিয়ে গেছে। যার ফলে পাটে ফলন কম। এবং আঁশ হয়েছে পাতলা। যদি পাটের ন্যায্যমূল্য থাকতো তাহলে এতেই পুষিয়ে যেত।

পাটের আঁশ ছাড়ানো শ্রমিক লোকমান হোসেন জানান, সকাল ৮টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২ টা পর্যন্ত পাটের আঁশ ছাড়ানোর মজুরি ৬০০ টাকা। প্রায় ১মাস ধরে পাট সংগ্রহের ভরা মৌসুম। চাষিরা দাম পেলে আমাদেরও ভাল লাগে। বৈরী আবহাওয়ার কারনে পাটের ফলন কম এবং ওজন হচ্ছেনা। পাট মোটা না হওয়ায় আঁশ ছাড়ানোর শ্রমিক লাগছে বেশি।

নওয়াপাড়া গ্রামের পাট ব্যাবসায়ী আফিরুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন, কালিগাংনীর শহিদুল ইসলাম, গোপালনগর গ্রামের ব্যবসায়ী আজমাইন হোসেন জানান, শুকনা পাটের বর্তমান বাজার মুল্য ১৯৫০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা। কাঁচা পাট বিক্রি হচ্ছে ৪৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা বেল। মেহেরপুরের পাট বড় না হওয়ায় পাটের চাহিদা কম। এখন পর্যন্ত পাট কিনছি। কিন্তু বিক্রি করতে পারছিনা। পাট শুকিয়ে গোডাউনে রেখে দিচ্ছি। আগামীতে দাম পেলে বিক্রি করবো। আর যদি দাম আরও কমে যায় তবে লোকসান হবে।

পাট ব্যবসায়ী ইন্দাদুল হক বলেন,নদী এলকার পাটের দাম ভাল । কিন্তু মেহেরপুর জেলায় খাল বিল বা পুকুরে পানি না থাকায় পাটের রং সোনালী হওয়ার পরিবর্তে কাদাযুক্ত কালো হচ্ছে। যার ফলে এখানকার পাটের চাহিদা একেবারেই কম। পাট প্রক্রিয়াজাতকরন কোন কোম্পানি পাট কিনতে চাচ্ছেনা।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, আমাদের মেহেরপুর জেলায় অনাবৃষ্টির কারনে পাট বাড়তে পারেনি। আঁশ হয়েছে পাতলা। ওজনও কম হচ্ছে। খালে বিলে পাট পচানোর জন্য পানি না পেয়ে কৃষকরা গর্ত করে সেচ দিয়ে পাট পঁচানোর ব্যবস্থাকরছেন। এতে পাটের যে প্রকৃত রং তা হচ্ছেনা। ফলে নদী এলাকার পাটের তুলনায় দাম কম পাচ্ছেন। তারপরেও সনাতন পদ্ধতি বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাট পঁচানো এবং আঁশ সংগ্রহে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

অন্যদিকে হিজলি কাপাশহাটিয়া ঘোরদহ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সভাপতি ইন্দ্রজিত হালদার এলাকার দূস্থ জেলেদের নিয়ে সরকারের সকল প্রকারের নিয়ম নীতি মেনে ১৪,১৫,০০০ চৌদ্দ লক্ষ পনের হাজার টাকা ব্যাংক চালান ফরম টি,আর ফরম নং (এস,আর,৩৭ দ্রষ্টব্য) টাকা দিয়ে বাওড় ইজারা নিয়েছেন। যা বুঝে পাওয়ার আগেই হঠাৎ করেই বাওড়ের বাঁধ কেটে দেওয়ায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে।

চলতি সমিতির মেয়াদ শেষ হতে ২ মাস বাকি নতুন সমিতি বুঝে পাওয়া আগে বাঁধ অপসারণে ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে জেলেরা আর তাইতো জেলেদের কথা ভেবে নিশ্চয়ই সুবিচার করবেন প্রশাসন এমনটাই দাবি ক্ষতিগ্রস্থ দুই সমিতির জেলেদের।

এ ব্যাপারে হরিণাকুন্ডু উপজেলা সহকারী কমিশন (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিরুপমা রায় বলেন, আমি কিছুই বলতে পারবো না, আপনি ডিসি স্যারের সাথে কথা বলেন।